□


২১.০ উদ্দেশ্য

২১.১ প্রস্তাবনা

২১.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা

২১.২.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত কিছু বক্তব্য

২১.৩ রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি

২১.৪ রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক

২১.৪.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ

২১.৪.২ মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও তার প্রকারভেদ

২১.৫ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি বা নির্ধারকসমূহ

২১.৫.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদান

২১.৫.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রতীক

২১.৬ রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব

২১.৭ সারাংশ

২১.৮ অনুশীলনী

২১.৯ গ্রন্থপঞ্জী


## ২১.০ উদ্দেশ্য

**এই এককটির উদ্দেশ্য হল আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা এবং তার বিভিন্ন দিকের সঙ্গে আপনার পরিচয় স্থাপন। এটি পড়ে আপনি জানতে পারবেন—**

- রাজনৈতিক সংস্কৃতি স¥¤ন্ধে বিভিন্ন লেখকের ধারণা
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির কিছু বিশেষত্ব?
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক (dimension), রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ (classification), মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং তার প্রকারভেদ (types)
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি, রাজনৈতিক সংস্কৃতির উপাদান, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রতীক
- রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব

## প্রস্তাবনা

বৈধতা অর্জনের জন্য যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায়, রাজনৈতিক কর্তৃত্বের সুষ্ঠু পরিচালনা এবং সেই কর্তৃত্বের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ও ইতিবাচক সমর্থনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিবেশ প্রয়োজন। কোনও কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এই দৃষ্টিভঙ্গীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়, কোথাও কোথাও আবার এই দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব দেখা যায়। তাই প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নাগরিকেরা কোথাও নিঃশর্তে সমর্থন করেন ও প্রয়োজনীয় আনুগত্য দেখান। কোথাও আবার নাগরিকেরা রাজনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী। এর থেকে আপনারা সহজেই বুঝবেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র জানার জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুসৃত হয়। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গী খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ।

আগের অনেক লেখক জাতির রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেভাবে চলে তার কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁরা সকলেই সেই জাতির সদস্যদের বিশ্বাস, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর আলোকপাত করেছেন। এ প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রীসের রাজনীতিচর্চা ও মন্টেস্কু, টকভিল ও বেজহটের লেখার উল্লেখ করা যায় তবে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ বিংশ শতকেই শুরু হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার উদ্দেশ্যে গ্যাব্রিয়েল এ. অ্যালমন্ড সর্বপ্রথম রাজনৈতিক সংস্কৃতি কথাটি ব্যবহার করেন।

## রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণা

অ্যালান বল মনে করেন যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি কথাটির কোনও প্রকৃত সংজ্ঞা পাওয়া কঠিন। তবে বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনৈতিক সংস্কৃতির যেভাবে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা আপনাদের জানাই।

গ্যাব্রিয়েল এ অ্যালমন্ড ও জি. বিংঘাম পাওয়েলের মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের মধ্যে রাজনীতির প্রতি ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতার ধরন। অ্যালান বল মনে করেন যে, রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস, ভাবাবেগ ও মূল্যবোধকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা হয়। সিডনি ভার্বা রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অভিজ্ঞতামূলক বিশ্বাস, সুস্পষ্ট প্রতীক ও মূল্যবোধের ধারক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। সেগুলি যে পরিবেশে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত করে, তার স¥¤ন্ধে পরিষ্কার ধারণা দেয়। লুসিয়ান পাইয়ের মতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল কতকগুলি দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস ও অনুভূতির সমষ্টি যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে অর্থবহ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তোলে। বুবলাটস্কি মনে করেন যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী, সামাজিক স্তর ও রাজনৈতিক ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের জ্ঞান ও অনুভূতির ধরন এবং তাদের রাজনৈতিক ক্রিয়াশীলতার তারতম্য।

### ২১.২.১ রাজনৈতিক সংস্কৃতি স¥¤

রাজনৈতিক সংস্কৃতি ক্রিয়াকলাপকেন্দ্রিক নয়, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত ধারণা ও বিশ্বাসকে বোঝায়। রাজনীতির জগতে কী ঘটছে তার বদলে সেই ঘটনাবলী স¥¤ন্ধে জনগণের কী দৃষ্টিভঙ্গী ও তার আলোচনাই হল রাজনৈতিক সংস্কৃতি। এই দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন রকমের হতে পারে; বাস্তব রাজনৈতিক জীবন স¥¤ন্ধে

অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা বা বিশ্বাস হতে পারে, রাজনৈতিক জীবনে অনুসরণযোগ্য লক্ষ্য বা মূল্যবোধসংক্রান্ত ধারণা বা বিশ্বাস হতে পারে। এগুলি আবেগমূলকও হতে পারে, উপলব্ধিমূলকও হতে পারে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কর্তৃত্বের হস্তক্ষেপ থাকতে পারে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি পুরোপুরি উদ্দেশ্যমূলকভাবে সৃষ্ট। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি সচেতনভাবে অনুভূত নাও হতে পারে। রাজনৈতিক কর্তৃত্বের আওতার বাইরে বিভিন্ন উপাদানের প্রভাবেও রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত সম্পর্কের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সৃষ্ট হয়। তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতির মধ্যে এক ধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে, যা পুরোপুরি সরকার-নিয়ন্ত্রিত ও স্থিরীকৃত ব্যবস্থায় রাখা যায় না।

রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে রাজনীতির মনস্তত্ত্বমূলক মাত্রা বলা যায়। এটির একটি বিষয়ীগত পরিধি আছে, যা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে অর্থবহ ও সুদৃঢ় করে। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক আদর্শ ও কার্যকরী ধারা উভয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক সংস্কৃতি উদ্দেশ্যহীন নয়, সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারার প্রতিফলন, যে ধারা সুবিন্যস্ত এবং যার বিভিন্ন দিক পরস্পরকে শক্তিশালী করে।

শুধুমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জ্ঞানের মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয় না। রাজনৈতিক সংস্কৃতি স¥¤ন্ধে সচেতনতাই রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট করে তোলে। এ প্রসঙ্গে অ্যালান বল ব্রিটেনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে লর্ডসভা ও রাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা, সামাজিক দিক থেকে উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তিদের সিদ্ধান্ত গ্রহণে পারদর্শিতা ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ, সাধারণ মানুষরা যে উচ্চতর শ্রেণীর লোকদের এবং লর্ডসভা ও রাজতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তা ব্রিটেনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম অংশ।

রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে যদি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে জনগণের মধ্যে একই ধরনের মনোভাব কাজ করে, তবে সেখানে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে মতৈক্য দুর্বল, সেখানে বিশৃঙ্খলা বা বিপ্লব ঘটতে পারে। মতৈক্য সামাজিক উদ্দেশ্য সংক্রান্ত বিষয় এবং সেই উদ্দেশ্য অভিমুখে পৌঁছানোর পদ্ধতি—এই দুই বিষয়েই থাকা প্রয়োজন। পৃথিবীর যে কোনও বিপ্লবকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল রাজনৈতিক মতৈক্যের অনুপস্থিতির জন্য। বর্তমান ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এখন যে অস্থিরতা দেখা যায়, তার মূলে আছে রাজনৈতিক সংস্কৃতি স¥¤ন্ধে মতৈক্যের অনুপস্থিতি।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি অপরিবর্তিত থাকে না। সমাজের সংস্কৃতিগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতিও অবিরত পুনর্বিন্যস্ত হতে থাকে। বসবাসের জন্য বহির্দেশীয়দের ব্যাপকহারে আগমন, বিপ্লব, যুদ্ধ, যুদ্ধে পরাজয় বা অন্য কোনও রকমের বৃহৎ পরিবর্তনের ফলে কোনও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হতে পারে। তার ফলে রাষ্ট্রের সরকার ও নীতিতেও পরিবর্তন দেখা যায়। ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সে বা বলশেভিক বিপ্লবের পর পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুরূপ পরিবর্তন ঘটেছিল। যুদ্ধে পরাজয়ের পর বিজিত রাষ্ট্রের ওপর বিজয়ী রাষ্ট্র তার রাজনৈতিক মূল্যবোধ চাপিয়ে দিতে চেষ্টা করে। ১ম ও ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বরাজনীতিতে তার প্রাধান্য বিস্তার করেছে এবং এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে তার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠা করেছে। এই দেশগুলিকে আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব চালান করার চেষ্টা করেছে। ফলে, সাহায্যপ্রাপ্ত দেশগুলির রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে মার্কিন প্রভাব কিছু পরিবর্তনের সূচনা করেছে। রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে

নতুন মূল্যবোধ বা মনোভাবের সামঞ্জস্য সাধনের ক্ষেত্রে সাফল্য ও ব্যর্থতার ওপর রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোনও অবশিষ্ট ব্যাখামূলক প্রকৃতিযুক্ত (Residual Explanator Category) নয়। এর মধ্যে যে ঘটনাবলীর কথা বলা হয় সেগুলি চিহ্নিত করা যায় এবং অনেকাংশে তাদের পরিমাপও করা যায়। জনমত ও দৃষ্টিভঙ্গীগত সমীক্ষা হল প্রাথমিক ধাপ, যার সাহায্যে বড় গোষ্ঠীর রাজনৈতিক সংস্কৃতি পরীক্ষা করা যায়। বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি ব্যক্তিগত ঘটনা স¥¤ন্ধে পরিসংখ্যান দিতে পারে। সরকারি বক্তব্য, বক্তৃতা, লেখা, অতিকথা (Myth) ও লৌকিক উপাখ্যান (Legend) রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারার প্রকৃতি স¥¤ন্ধে জানতে সাহায্য করে। তাছাড়াও রাজনৈতিক আচরণ থেকেও রাজনৈতিক সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গী জানা যায়।

তবে জনমত ও দৃষ্টিভঙ্গীগত সমীক্ষা, সরকারি বক্তব্য, রাজনৈতিক আচরণ ইত্যাদি থেকে রাজনৈতিক সংস্কৃতি নির্ধারণে নানা সমস্যাও দেখতে পাওয়া যায়। জনগণ তাদের প্রতিক্রিয়া অনেক সময় লুকিয়ে রাখে। যোগাযোগ ও ব্যাখ্যাসংক্রান্ত সমস্যাও গভীর। রাজনৈতিক আচরণের ক্ষেত্রে নানা ধরনের উপাদান সংযুক্ত। তাদের পৃথক করা খুবই কঠিন। তবুও রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিষয়ে যতদূর সম্ভব নির্ভরযোগ্য তথ্যসংগ্রহের প্রচেষ্টা অবশ্যই করা উচিত, কারণ তা রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**১**

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সম্পর্কে চারজন রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ধারণা লিখুন।
(৪ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

২। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধারণাটিকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করুন।
(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

## রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি

অধিকাংশ রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই নানা ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব দেখতে পাওয়া যায়। ভাষাগত পার্থক্য, আঞ্চলিক গোষ্ঠীগত মনোভাব, শিক্ষার স্তর, জাতিগত সদস্যপদ, ভৌগোলিক অবস্থান, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মর্যাদা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রসঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধগত পার্থক্য থাকে। তাই অ্যালান বল বলেছেন যে, স্থিতিশীল সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমজাতীয় নয়। যেখানে একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যদের পার্থক্য খুবই প্রকট, সেখানে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি দেখতে পাওয়া যায়। যখন কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কোনও বিশেষ গোষ্ঠীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ধরন অন্যদের থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক করা যায়, তখন তাকে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি বলে। অ্যালমন্ড এবং পাওয়েলের মতে, প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে নির্দিষ্ট এক ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পৃথকভাবে প্রতীয়মান হলে তাকে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। অ্যালান বলের অভিমত অনুসারে, উপসংস্কৃতি বলতে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের ধরনকে বোঝায় না; এক বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গীকে বোঝায়, যার কিছু কিছু অন্যান্য উপসংস্কৃতির সঙ্গে সমজাতীয়। অর্থাৎ কিছু কিছু আবার সমজাতীয় নয়। ফরাসী কানাডীয়রা উপসংস্কৃতির একটি উদাহরণ। তারা মনে করে

যে, কানাডার প্রতি সামগ্রিক আনুগত্যের থেকে তাদের গোষ্ঠীর প্রতি আনুগত্য অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই দৃষ্টিভঙ্গী খুবই প্রবল হওয়ায় কুইবেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন খুবই শক্তিশালী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণকায় নিগ্রোরা রাজনৈতিক উপসংস্কৃতির উদাহরণ।

যে কোনও দেশের রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি স¥¤ন্ধে ধারণা ছাড়া সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি অনুধাবন অসম্ভব হয়ে পড়ে। তৃতীয় বিশ্বের অনেক বিকাশশীল দেশে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতির সমস্যা খুবই প্রবল। অঞ্চল, ধর্ম, সামাজিক শ্রেণী, জাতি, ভাষা, প্রজন্ম ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে সেখানে নানা ধরনের উপসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ভারতবর্ষেও জাতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে উপসংস্কৃতিগত পার্থক্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ দিক। শিখ উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপ বা বিভিন্ন অঞ্চলের গোষ্ঠীগত বা আঞ্চলিক মনোভাব ও আন্দোলন ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার গতিবিধির অনুধাবনের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যবহ।

সাধারণত উপসংস্কৃতি সমাজের প্রধান কাঠামোগত ব্যবস্থাকে বাধা দেয় না। কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্ত সংক্রান্ত কয়েকটি বিশেষ প্রশ্নে পৃথক ধারণা করে। এর ফলে সাধারণত রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিচালকদের কোনও অসুবিধা হয় না। তারা মূল্যের পুর্নবণ্টনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করতে পারে। কিন্তু যদি উপসংস্কৃতি মূল কাঠামোগত ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ করে, তাহলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয়। তখন রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বলপ্রয়োগ দ্বারা অবস্থা আয়ত্বে আনতে বাধ্য হয়। এর ফলে সমাজে অস্থিরতা ও উত্তেজনা দেখা দেয়। ভারতে ভাষাগত বা আঞ্চলিক বিভিন্ন অপসংস্কৃতিগত গোষ্ঠী মাঝে মাঝে এরূপ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। আবার কোথাও কোথাও প্রধান রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল কোনও জাতিগোষ্ঠীর উপসংস্কৃতি। যেমন, ইথিয়োপিয়ায় প্রধান রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল সেখানকার একটি বিশেষ গোষ্ঠী আমহারাটেদের উপসংস্কৃতি।

২

১। রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়?

(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনারা উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

## রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক (Dimensions)

আপনারা আগেই দেখেছেন যে, রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল কিছু দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা, যা একটি সমাজের জনগণ রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনুভব করে। অ্যালমন্ড এবং পাওয়েলের মতে, এই মানসিকতার তিনটি দিক (Dimensions) আছে ঃ-

**(১) জ্ঞান বা ধারণাসংক্রান্ত দিক (Cognitive Orientations)**—এর অর্থ হল রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয় বা রাজনৈতিক বিশ্বাস সংক্রান্ত নির্ভুল ধারণা বা জ্ঞান। একজন ব্যক্তির সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকলাপ, যেমন তাঁরা কী ধরনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রদান করেন, সরকারি নীতি কী ধরনের বা সমসাময়িক সমস্যাগুলি কী কী, এ সংক্রান্ত সঠিক জ্ঞান বা ধারণা থাকতে পারে। এই জ্ঞান বা ধারণা হল রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রথম দিক।

**(২) প্রভাবী দিক (Affective Orientation)**—এর অর্থ হল রাজনৈতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুভূতি, যেমন রাজনৈতিক বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকা বা একাত্মবোধ করা বা রাজনৈতিক বিষয়কে প্রত্যাখ্যান করা। ব্যক্তির রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য বা ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যানের অনুভুতি হল রাজনৈতিক সংস্কৃতির দ্বিতীয় দিক।

(৩) **মূল্যায়নমূলক দিক (Evaluative Orientation)**—এর অর্থ হল রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে বিচার বা মতামত, অর্থাৎ রাজনৈতিক বিষয় বা ঘটনার মূল্যমান বিচার বা মূল্যায়ন। যে কোনও ব্যক্তি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল্যায়ন করতে পারে। গণতান্ত্রিক আদর্শের ভিত্তিতে বিচার করে সে রাজনৈতিক ব্যবস্থাটিকে রাজনৈতিক চাহিদার প্রতি যথোপযুক্ত দায়িত্বশীল মনে না করতে পারে। তার নৈতিক বিচার অনুসারে সে সরকারি অসাধুতা বা স্বজনপ্রীতির নিন্দা করতে পারে। এই বিচার হল রাজনৈতিক সংস্কৃতির তৃতীয় দিক।

যে কোনও রাজনৈতিক বিষয়ের ওপর ব্যক্তিগত মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গীকে এই তিনটি দিকের ভিত্তিতে বিচার করা যায়। তিন ধরনের দিকই আবার পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং একই ব্যক্তির রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের বিচারের ক্ষেত্রে তিনটি দিক নানাভাবে মিশ্রিত হতে পারে। জনগণের মধ্যে বিভিন্নভাবে বর্তমান এই দিকগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যপ্রণালীকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপর চাহিদা, সমর্থনের জন্য ব্যবস্থা, আইনের মান্যতা, ব্যক্তির ব্যবহার ও রাজনৈতিক ব্যবহারের ধরন, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা এবং রাজনৈতিক ঘটনার পূর্বসংকেত প্রদানের ক্ষেত্রেও এই তিনটির গুরুত্ব অপরিসীম। রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত এই তিনটি দিক যে কোনও রাজনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত হতে পারে যেমন—

(ক) সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা—জনগণের সামগ্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥¤ন্ধে জ্ঞান, অনুভূতি ও মূল্যায়ন থাকে এবং এগুলি জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বিকাশে সাহায্য করে। এজন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার দৈহিক সদস্যপদই যথেষ্ট নয়, মানসিকভাবেও সদস্য হওয়া প্রয়োজন।

(খ) রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপকরণ—উপাদান প্রক্রিয়া (Input-Output Process) স¥¤ন্ধে জনগণের জ্ঞান, অনুভূতি ও বিচার থাকে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজের চাহিদাগুলি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রবাহিত হয়ে কর্তৃত্বমূলক নীতিতে রূপান্তরিত হয়। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, গণমাধ্যম ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(গ) আমলা, বিচারব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, ভূমিকা এবং ঐ ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স¥¤ন্ধে জনগণের জ্ঞান, অনুভূতি ও মূল্যায়ন থাকে, কারণ এদের কাজ হল কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করা।

(ঘ) রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অভিনেতা (Political Actor) হিসাবে ব্যক্তির নিজের ভূমিকা এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের ভূমিকা স¥¤ন্ধেও ব্যক্তির জ্ঞান, অনুভূতি ও বিচার প্রযুক্তি হয়।

(ঙ) বিশেষ রাজনৈতিক নীতি ও প্রশ্ন স¥¤ন্ধে জনগণের জ্ঞান, অনুভূতি ও বিচার থাকে।

৩

১। রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক তিন ধরনের দিক কী কী? এগুলির গুরুত্ব আছে কী?

(১০ পঙ্‌ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

**২১.৪.১**

এই পাঁচ ধরনের রাজনৈতিক বিষয় স¥¤ন্ধে তিন ধরনের দিক বিচার করে সমাজের রাজনৈতিক সংস্কৃতি জানতে পারা যায়। এই দিকগুলির প্রকৃতি এবং অস্তিত্ব এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে পৃথক হয়। তাই

রাজনৈতিক সংস্কৃতিও সবদেশে এক হয় না। সমাজের সদস্যরা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে কিনা, সরকারি ক্রিয়াকলাপ থেকে উপকার আশা করে কিনা, সরকারের সঙ্গে একাত্মবোধ করে কিনা, অথবা সমাজে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা দেখা যায় কিনা, জনগণ সরকারি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ আশা করে কিনা বা সরকারি কার্যকলাপ স¥¤ন্ধে জানতে পারে কিনা—এই প্রশ্নগুলির ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ করা যায়। অর্থাৎ, উপকরণ-উৎপাদান প্রক্রিয়া ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর বণ্টন, রাজনৈতিক বিষয়গুলির সম্পর্কে অবহিত থাকা বা না থাকা এবং ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপে রাজনৈতিক বিষয়গুলির গুরুত্বের ভিত্তিতে যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার চিহ্নিতকরণ ও বৈশিষ্ট্যকরণ (Characterisation) করা যায়। অ্যালমন্ড ও ভার্বা তিন ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির উল্লেখ করেছেন। যথা—

**(১) অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Participatory Political Culture)**—এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ব্যক্তি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকে, উপকরণ কাঠামো ও প্রক্রিয়ার প্রতি ইতিবাচক মনোভাবাপন্ন হয়, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন অনুসারে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করার অধিকার ভোগ করে। অর্থাৎ, এখানে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, ব্যবস্থা, উপকরণ-উৎপাদন কাঠামো ও ব্যক্তির রাজনৈতিক ভূমিকা সংক্রান্ত ধারণাগত, প্রভাবী ও মূল্যায়ন মূলক দিকগুলি খুবই উচ্চমানের। উদাহরণ হল ব্রিটেন, স্ক্যান্ডিনেভিয়া ও আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থা।

**(২) অধীনস্থ বা শাসিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Subject Political Culture)**—এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ব্যক্তির ইতিবাচক মনোভাব থাকে এবং ব্যবস্থার উৎপাদন (Output) যেমন, কল্যাণকর আইনব্যবস্থা, সুযোগসুবিধা ইত্যাদি তাদের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করে তাও বুঝতে পারে, কিন্তু তারা উপকরণ (Input) কাঠামোতে অংশগ্রহণ করতে পারে না। ফলে, রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে তাদের সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। উপকরণ কাঠামোতে ধারণাগত, প্রভাবী ও মূল্যায়নমূলক ভূমিকা না থাকায় জনগণ শাসকগোষ্ঠীর ও আমলাদের নির্দেশ মেনে চলে ও সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তারা বাস্তব সত্য হিসাবে মেনে নেয়, তাকে পরিবর্তনের ক্ষমতা তাদের থাকে না। রাজনৈতিক অভিনেতা (Actor) হিসাবে নিজের স¥¤ন্ধে কোন ধারণা থাকে না। এখানে ব্যক্তির ভূমিকা পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। সে এই ব্যবস্থাকে কোনওভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না এবং ব্যবস্থার কর্তৃত্বমূলক সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করতে পারে না। সে মনে করে যে, তার ভূমিকা হল ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা, পরিবর্তনের প্রচেষ্টা করা নয়। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এবং বিংশ শতকে স্বাধীন এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে এই ধরনের রাজনৈতিক সংস্কৃতি দেখা যায়।

**(৩) সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Parochial Political Culture)**—এখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥¤ন্ধে জনগণের সামান্য কোনও জ্ঞান বা ধারণা (Cognition) থাকে না। সুতরাং, প্রভাবী বা মূল্যায়নের (Affective and Evaluative) প্রচেষ্টাও থাকে না। ব্যক্তি তার প্রয়োজনের সময় শুধুমাত্র নিজ পরিবার, জনসম্প্রদায় বা নিজ প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান স¥¤ন্ধে উদাসীন থাকে। এই জাতীয় জনগণ আধুনিক পশ্চিমী সমাজে দেখা যায় না। বস্তুত আধুনিক সমাজেই তারা দুষ্প্রাপ্য। কোনও কোনও পরিবর্তনশীল (Transitional) সমাজের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতিযুক্ত বৃহৎ বা ক্ষুদ্র আঞ্চলিক গোষ্ঠী পাওয়া যেতে পারে, যারা জাতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্বারা কোনওভাবেই প্রভাবিত নয়। উদাহরণ হল ভারতের সাবেকী গ্রাম্যসমাজ। এখানে এমন ব্যক্তিদের দেখা পাওয়া যেতে পারে, যারা ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥¤ন্ধে পুরোপুরি অজ্ঞ। দৃষ্টিভঙ্গী শুধুমাত্র গ্রামীণ পুরোহিত বা আঞ্চলিক নেতাদের পরিপ্রেক্ষিতেই গড়ে ওঠে--যারা একই সঙ্গে বিভিন্ন ভূমিকা পালন করে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার এই তিন ধরনের শ্রেণীবিভাগ অনুসারে রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলিকে ভাগ করা যায়। কিন্তু এগুলি হল আদর্শ ধরন—কোথাও অবিকৃতভাবে এগুলির অস্তিত্ব দেখা যায় না। নাগরিকরা কোথাও একভাবে আচরণ করে না। তাই রাজনৈতিক সংস্কৃতি কোথাও সমসত্ববিশিষ্ট বা সমজাতীয় (Homogeneous) নয়। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বহু নাগরিক থাকতে পারে, যারা সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। আবার কিছু নির্লিপ্ত নাগরিকও সেখানে দেখা যেতে পারে। বহু ব্যক্তি সরকারি নিয়ম বিনা প্রতিবাদে মেনে চলে, অনেকে আবার তার সমালোচনায় মুখর থাকে। অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও অনেক ব্যক্তি থাকতে পারে যারা অধীনস্থ বা শাসিত মনোভাবযুক্ত, অর্থাৎ প্রায় সব সমাজেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি মিশ্র আকারের।

তিনটি শ্রেণীবিভাগের ভিত্তিতে রবার্ট স্কট ১৯১০ ও ১৯৬০-এ মেক্সিকোর রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন আলোচনা করেছেন। ১৯১০-এ মেক্সিকোর অধিবাসীদের ৯০% ছিল সংকীর্ণ (Parochial) ৯% অধীনস্থ (Subject) এবং ১% অংশগ্রহণকারী (Participant) । ১৯৬০-এ এই সংখ্যাগুলি ছিল যথাক্রমে ২৫%, ৬৫% এবং ১০%।

বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যবোধের গুরুত্বের তারতম্য থেকে সামগ্রিক রাজনৈতিক সংস্কৃতিগত পরিবেশ ঠিকমত বোঝা যায়। এই তিন ধরনের শ্রেণীবিভাগের বিভিন্ন একত্রিতকরণ অনুসারে রাজনৈতিক কাঠামোকে পুনরায় শ্রেণীবিভাগ করা যায়। তাই অ্যালমন্ড ও ভার্বা চার ধরনের মিশ্র বা মিশ্রিত রাজনৈতিক সংস্কৃতির কথা বলেন।

**(১) সংকীর্ণ অধীনস্থ রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Parochial Subject Political Culture)**—এখানে ব্যক্তি সরকারি ভূমিকার বিভিন্ন ধরন স¥¤ন্ধে ওয়াকিবহাল, কিন্তু বিভিন্ন উপায়ে কীভাবে সে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে পারে সে স¥¤ন্ধে অজ্ঞ। তা ছাড়াও রাজনৈতিক অভিনেতা (Actor) হিসাবে নিজের স¥¤ন্ধে তার ধারণাও খুবই অস্পষ্ট ও অবিকশিত। উপকরণ (Input) কাঠামোকে ভালোভাবে বোঝানো হয় না।

**(২) অধীনস্থ অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Subject Participant Political Culture)**—এখানে কোনও কোনও ব্যক্তি রাজনৈতিকভাবে খুবই সচেতন ও সক্রিয়, কিন্তু বাকিরা নিষ্ক্রিয়। প্রথমোক্তরা বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীযুক্ত। তারা জানে যে, তাদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হবে। আবারও এও জানে যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ কম। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অধীনস্থ অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা যায়। এখানে আশা করা হত যে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে নাগরিকরা নিজেদের যুক্ত করবে এবং সোভিয়েত সরকারের কার্যাবলী স¥¤ন্ধে সজাগ থাকবে। নাগরিকদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীতে সংযুক্ত থাকার জন্য উৎসাহিত করা হত। অথচ, একই সময় শাসকগোষ্ঠী শাসিতদের থেকে আনুগত্য ও সরকারি নির্দেশের প্রতি ঐক্যমত আশা করত।

**(৩) সংকীর্ণ অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Parochal Participant Political Culture)—** এখানে উপকরণ (Input) কাঠামো প্রধানত আঞ্চলিক, যেমন উপজাতীয় বা জাতি-সংগঠন, যদিও উপকরণ কাঠামো খুবই উন্নত। কিন্তু উপকরণ-উৎপাদন উভয় কাঠামোই সংকীর্ণ স্বার্থের চাপ বিশিষ্ট হওয়ায় জাতীয় অংশগ্রহণকারী সংস্থা হিসাবে তাদের কার্যাবলী খুবই প্রভাবিত হয়।

**(৪) পৌর সংস্কৃতি (Civic Culture)—**এর মধ্যে তিনটি আদর্শ রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংযুক্ত। অধীনস্থ মানসিকতা থাকায় সমাজের গণমান্য শ্রেণী যথেষ্ট উদ্যম ও স্বাধীনতার সঙ্গে কাজ করতে পারে। অন্যদিকে অংশগ্রহণকারী মানসিকতা থাকায় গণমান্য শ্রেণী জনগণের পছন্দ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য হয়। অ্যালমন্ড ও ভার্বার মতে, ব্রিটেন ও আমেরিকার রাজনৈতিক সংস্কৃতি হল পৌর সংস্কৃতির পরিপূর্ণ রূপ।

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ কীভাবে করা যায়?
(১০ পঙ্ক্তির মধ্যে উত্তর সীমাবদ্ধ করুন)

২। মিশ্র সংস্কতি কী? মিশ্র সংস্কৃতির ধরনগুলি কী কী?
(১০ পঙ্ক্তির মধ্যে উত্তর সীমাবদ্ধ করুন)

## রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি বা নির্ধারকসমূহ

রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমজাতীয় বা মিশ্র, যাই হোক না কেন তা বিভিন্ন উপাদানের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে। উপাদানগুলি সংখ্যায় অনেক এবং তাদের সম্পর্কও নিবিড়। এই ভিত্তিতে উপাদানগুলিকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি বা নির্ধারকও বলা যায়। নির্ধারকগুলি হল ঃ—

**(১) ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা**—যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারার প্রভাব অনস্বীকার্য। নিরবচ্ছিন্নতা বা বিচ্ছিন্নতা যে কোনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার ঐতিহাসিক ভিত্তি স¥¤ন্ধে জানতে সাহায্য করে। এই প্রসঙ্গে অ্যালান বল আলোচিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারার পর্যালোচনা উল্লেখযোগ্য। গ্রেট ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় একটি নিরবচ্ছিন্ন ধারা লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহ্যগত মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক অভিনব সমন্বয় ব্রিটেনের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য। রক্ষণশীল ইংরেজ জাতির ঐতিহ্যবোধ ও সাবেকী মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্পোন্নত সমাজের আধুনিক মূল্যবোধের মিশ্রণ ঘটেছে। কোনও বিচ্ছিন্নতা ছাড়াই ব্রিটেনের সাবেকী অভিজাততান্ত্রিক কাঠামো শহুরে শিল্পোন্নত সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে।

অথচ ফ্রান্সের ঐতিহাসিক বিকাশ ভিন্ন ধরনের। ১৭৮৯-এ সংগঠিত ফরাসী বিপ্লব তৎকালীন ফ্রান্সের প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামো, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটায়। নিরবচ্ছিন্নতার বদলে বিচ্ছিন্নতা ফ্রান্সের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। ফরাসী বিপ্লবজাত নতুন বৈপ্লবিক মূল্যবোধ বিশ্বাসকেই ঊনবিংশ ও বিংশ শতকের রাজনৈতিক সংঘাতের কারণ বলা যায়।

আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল প্রধানত ব্রিটেনের সঙ্গে সংযোগ ছিন্ন করার প্রচেষ্টা। এই যুদ্ধ উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি স¥¤ন্ধে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করে, যা পরবর্তীকালে আমেরিকার সংবিধানে গৃহীত হয়। ফলে এখানে অতীতের সঙ্গে যোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হয় নি। অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধের পর সাম্যমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। এই ব্যবস্থা পরবর্তীকালে শিল্পায়ন ও ব্যাপক অভিবাসনের (Immigration) ফলেও পরিবর্তিত হয় নি।

**(২) ঔপনিবেশিক শাসন**—রাজনৈতিক সংস্কৃতির কাঠামো নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব প্রতিক্রিয়াকে অস্বীকার করা যায় না। এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন নতুন রাষ্ট্রের ওপর দীর্ঘকালীন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন সেই রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানকে প্রভাবিত করেছে। শাসকগোষ্ঠী প্রচলিত রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা উপনিবেশগুলির অধিবাসীদের কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং সেগুলি স¥¤ন্ধে তাদের মধ্যে কিছুটা সহমতও দেখা যায়। ভারতের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসকের কাছ থেকেই গৃহীত হয়েছে।

**(৩) ভৌগোলিক অবস্থান**—ভৌগোলিক অবস্থান যে কোনও দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে। ব্রিটেনের জলবেষ্টিত দ্বীপ-অবস্থান ব্রিটেনের বৈদেশিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আমেরিকা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থায়িত্ব প্রদান করেছে।

**(৪) জাতিগত বিভিন্নতা**—দেশবাসীর মধ্যে জাতিগত বিভিন্নতা রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তবে জাতিগত বিভিন্নতার প্রভাব সব জায়গায় একরকম হয় না। জাতিগত পার্থক্য ব্রিটেনে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নানা জাতের মানুষ বসবাস করলেও সকলে মার্কিন জীবনধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। তারা নিজেদের মার্কিনী হিসাবে ভাবে এবং মার্কিন সরকারের প্রতি আনুগত্য দেখায়। জাতিগত পার্থক্য ও উপজাতির আনুগত্যের প্রভাব অনেক দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে নানা সমস্যা সৃষ্টি করেছে। জাতিগত প্রবণতা প্রবল হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আনুগত্য জাতীয় সরকারের বদলে নিজ জাতির প্রতি প্রদর্শিত হয়। জাতিগত ভিত্তিতে পররাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য সৃষ্ট হলে দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় উত্তেজনা ও অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।

**(৫) ধর্ম**—আধুনিক প্রযুক্তিবিজ্ঞান ও শিল্পায়নের বিকাশ সত্ত্বেও এবং ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও এমন সমাজ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায় যেখানে রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও ধর্মের সম্পর্ক খুবই গভীর। প্রধানত উন্নয়নশীল তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং ধর্মের রাজনীতিকরণ হয়েছে। ধর্মকে বাদ দিয়ে এই দেশগুলির রাজনৈতিক সংস্কৃতি আলোচনা সম্পূর্ণতালাভ করে না।

**(৬) আর্থসামাজিক কাঠামো**—আর্থসামাজিক কাঠামো রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম নির্ধারক। শহরকেন্দ্রিক ও শিল্পভিত্তিক সমাজ-ব্যবস্থায় শিক্ষা ও রাজনৈতিক যোগাযোগ বেশী থাকে। বিভিন্ন ধরনের স্বার্থগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তাই এই ধরনের সমাজের জনগণ অধিকমাত্রায় রাজনীতি-সচেতন, প্রগতিশীল উদারমনোভাবযুক্ত ও পরিবর্তনের পক্ষপাতী হন। সরকারি নীতি নির্ধারণেও তাঁরা অধিকমাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষা ও রাজনৈতিক যোগাযোগ কম। জনগণ মূলত কৃষক সম্প্রদায়ভুক্ত। তাই এই ধরনের সমাজে রক্ষণশীলতা ও পরিবর্তন বিরোধী প্রবণতা দেখা যায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের হারও সেখানে কম।

**(৭) রাজনৈতিক মতাদর্শ**—আধুনিক কালের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় দেশের জনগণের রাজনীতি সংক্রান্ত মনোভাব, মূল্যবোধ ও বিশ্বাস রাজনৈতিক মতাদর্শ দ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত হয়। তাই রাজনৈতিক মতাদর্শকে রাজনৈতিক সংস্কৃতির অন্যতম নির্ধারক বলা যায়। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ওপর শ্রেণীকাঠামোর প্রভাব অনস্বীকার্য। শ্রেণীগত অবস্থানের ওপর ব্যক্তির চেতনার প্রকৃতি নির্ভর করে। বিভিন্ন দেশের শ্রেণীকাঠামো বিভিন্ন রকম। তাই বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিও বিভিন্ন ধরনের হয়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনা প্রসঙ্গে অ্যালান বল দু'ধরনের উপাদানের কথা বলেছেন ঃ-

—রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎসের প্রতি সমর্থনসূচক মনোভাব রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করে এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালী করে। গ্রেট ব্রিটেনে রাজনৈতিক নেতাদের ওপর দেশবাসীর গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা দেখা যায়। মনে করা হয় যে, নেতারা জনস্বার্থেই কাজ করে—বিশেষ কোনও স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থে নয়। মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনীতিবিদদের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা অনেক কম, তবে এই শ্রদ্ধার অভাব মার্কিন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অস্থিতিশীলতার কারণ হয় নি।

—স্থিতিশীল উদারনৈতিক গণতন্ত্রে সরকারি কার্যাবলীর সীমাবদ্ধতা ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব থাকে। আবার সরকারি কাজের মাধ্যমে ব্যক্তির কল্যাণও আশা করা হয়। সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা

আর্থসামাজিক বিকাশের স্তর ও শিক্ষার বিকাশের হারের সঙ্গে সংযুক্ত। শিক্ষার মান উন্নত হলে নাগরিকের নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। শিল্পায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নতি ও এই সচেতনতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সচেতনতা বাড়লে সরকারি কাজ স¥¤ন্ধে জনগণের সতর্কতা বৃদ্ধি পায়, রাজনৈতিক অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পায়। জনগণের নিজেদের সম্পর্কে সামর্থ্যের চেতনা বৃদ্ধি পেলে প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সন্তুষ্টি ও ব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য বাড়ে। ফলে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈধতা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

### ২১.৫.২ রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও প্রতীক

যে কোনও সমাজে রাজনৈতিক মূল্যবোধ, মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। যেমন জাতীয় পতাকা বা জাতীয় সংগীত ভারতীয় সংবিধানে প্রতীক হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের প্রতীকী মূল্য সকলেই স্বীকার করেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতির সক্রিয় ভূমিকা থাকলেও রাষ্ট্রপতি পদটি জনগণের কাছে প্রতীক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতীকগুলি প্রতিষ্ঠানের আদর্শমূলক উপাদানের প্রকাশ। জনগণের সামর্থ্যের স্তর বা রাজনৈতিক জ্ঞানের স্তরের সঙ্গে প্রতীকগুলির কোনও ওতপ্রোত স¥¤ন্ধ নেই। কিন্তু প্রতীকের মাধ্যমে জনগণের আবেগ অনুভূতি ব্যক্ত হয় এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। সমস্ত রাজনৈতিক ব্যবস্থাতেই প্রতীকের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

কোনও কোনও রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ধর্মনিরপেক্ষ প্রতীকের বদলে ধর্মীয় প্রতীকও ব্যবহার করা হয়। কোথাও কোথাও জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টির জন্য কোনও ধর্মগুরুর ভূমিকার ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রত্যেক জাতির জীবনে কিছু প্রাচীন গৌরব কাহিনী থাকে, যেগুলি জাতির মহত্ত্বের পরিচায়ক। অতীত সম্পর্কে এই সকল কাহিনী কখনও অসত্য, কখনও অর্ধসত্য হয়ে থাকে। অতীতের অবিশ্বাস্য কাহিনী বা অতিকথা রাজনৈতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্রিটেনের এলিজাবেথের রাজত্বকাল সম্বন্ধে অতিকথা ইংরেজ জাতির জীবনে মহত্ত্ব ও গৌরব সঞ্চার করে।

প্রতীক বিমূর্ত ধারণাকে বাস্তবায়িত করে এবং প্রাধান্যকারী রাজনৈতিক মূল্যবোধকে প্রকাশিত করে। রাজনৈতিক প্রতীকের সঙ্গে যুক্ত আবেগ উচ্ছ্বাসকে কাজে লাগিয়ে সরকার প্রচলিত রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি জনগণের সমর্থনসূচক মনোভাব জাগরণের প্রচেষ্টা করে। প্রতীকের মাধ্যমে সরকার তার বৈধতা প্রতিষ্ঠা করে এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার চেষ্টা করে। যে সমস্ত জাতি বা রাষ্ট্র ব্যাপক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে প্রতীকের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নতুন প্রতীকের মাধ্যমে পূর্বতন সরকারের স্মৃতিকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা চলে, নতুনভাবে জাতীয় ইতিহাস লিখিত হয় এবং নব রূপে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংহতি সৃষ্ট হয়।

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতির ভিত্তি বা নির্ধারকগুলি কী কী?
(১০ পঙ্ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ থাকবে)
২। রাজনৈতিক সংস্কৃতির দু'ধরনের উপাদানগুলি কী কী?
(৫ পঙ্ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ থাকবে)
৩। রাজনৈতিক প্রতীকের গুরুত্ব কী?
(৫ পঙ্ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ থাকবে)

## রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্ব

সমাজে আইন ও শৃঙ্খলা সংরক্ষণের প্রশ্নটি সরকারি সংস্থার প্রতি সমর্থনমূলক ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে। অনেক সময় নতুন জাতির সদস্যরা শুধুমাত্র সরকারি উৎপাদনের (Output) সুযোগসুবিধা এবং যে মাধ্যমগুলির সাহায্যে চাহিদা উপস্থাপিত হয় তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়। তারা ইতিবাচক ও সমর্থনমূলক অধীনস্থ দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করেনি এবং আইন মান্য করতে শেখে নি। ফলে সেখানে রাজনৈতিক ব্যবস্থা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সময় কোনও সমর্থন পায় না। অধিকাংশ নতুন জাতির ক্ষেত্রেই এই সমস্যা দেখা যায়।

যে সব ব্যক্তি উৎপাদন (Input) কাঠামোর প্রতি সহানুভূতিশীল এবং যাদের রাজনৈতিক সামর্থ্যসূচক দৃষ্টিভঙ্গী আছে তারা তাদের স্বার্থে প্রয়োজনের সময় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করবে আশা করা যায়। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার সঙ্গে অন্যান্য জাতির পার্থক্য দেখা যায়। আমেরিকার অনেক নাগরিকই কোনও স্থানীয় সমস্যার মুখোমুখি হলে কোনও স্থানীয় গোষ্ঠীকেই সমর্থন করবে এবং তাদের স্থানীয় সমস্যাগুলি চিহ্নিত করার চেষ্টা করবে। ইটালির নাগরিকরা মনে করে যে, ব্যক্তি হিসাবে সে সরকারি কাজকে খুব কমই প্রভাবিত করতে পারে। এর ফলে যখন অসন্তুষ্টি প্রবল না থাকে, তখন নিষ্ক্রিয় সমর্থন দেখা যায় যতক্ষণ অসন্তুষ্টি প্রবল না হয়, ততক্ষণ রাগ, হতাশা ও নৈরাশ্য চাপা থাকে। পরে তা হিংসাত্মক আকার নিতে পারে।

এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশে জাতপাতের তারতম্য ও উপজাতীয় আনুগত্য গুরুতর বিকাশসংক্রান্ত সমস্যার সৃষ্টি করেছে। জাতিগত, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও উপজাতীয় এককগুলির নানা ধরন থেকে আফ্রিকায় জাতির সৃষ্টি হয়েছে, যাদের মধ্যে সর্বজনগ্রাহ্য কোনও সাধারণ বন্ধন (Common Bond) নেই। ফলে সদস্যরা তাদের স্থানীয় এককের বাইরে কোনও তথ্য জানে না, আনুগত্যও দেখায় না। জাতি গঠনে প্রক্রিয়ায় জাতীয় সত্তা স¥¤ন্ধে তথ্য সম্প্রচারিত হওয়া প্রয়োজন, জাতীয় সত্তার প্রতি অঙ্গীকার প্রয়োজন। আফ্রিকা ও এশিয়ার নতুন জাতিগুলির ইতিহাসের কোনও-না-কোনও বিন্দুতে উপজাতীয় এককের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে জাতীয় আনুগত্যের দ্বন্দ্ব দেখা যায়। তখন জাতীয় অনন্যতার (Identity) প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।

জাতীয় অনন্যতার প্রশ্ন শুধুমাত্র নতুন আফ্রো-এশীয় জাতিগুলির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। আধুনিক কালে আমেরিকার অনেক দক্ষিণবাসীর কাছে জাতিগত বিচ্ছিন্নকরণের প্রশ্ন জাতীয় অনন্যতার (Identity) ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করেছে।

যে জাতির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের জাতীয় সংযুক্তির ঐতিহ্য নেই, সেখানে সমস্যাগুলি আরও গভীর; মীমাংসায় পৌছানো খুবই কঠিন ব্যাপার হতে পারে। স্থানীয় উপজাতি মনে করতে পারে যে, তার সামাজিক ও ধর্মীয় কাঠামো, স্কুল নির্মাণ, শিল্পগঠন বা জাতীয় সামরিক বাহিনীতে যুবকদের ভর্তি দ্বারা বিঘ্নিত হতে পারে; আনুগত্যের দ্বন্দ্বের চরম উদাহরণ হল গণস¥œোহনী নেতাকে কেন্দ্র করে উগ্র জাতীয়তাবাদ, যেমন ইজিপ্টের নাসের। মেক্সিকোর ব্যবস্থা মধ্যপন্থী সমাধান, সেখানে উচ্চ ধরনের সাধারণ সমর্থন ব্যবস্থা, একটি প্রাধান্যকারী দল ও সর্বজনস্বীকৃত বিপ্লবী প্রতীক নানা ধরনের বক্তব্য ও গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য সাধন করে। ভারতবর্ষ

আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভিত্তি থেকে একই লক্ষ্যে পৌঁছতে চেষ্টা করছে। সাফল্য ঘটেছে কি ঘটেনি তা পরবর্তীকালে বিবেচ্য বর্তমানে উপজাতীয় আনুগত্য বিভিন্ন স্থানে খুবই প্রকট এবং এগুলি প্রতিহত করা প্রয়োজন।

সমাজের রাজনৈতিক আস্থার সাধারণ স্তর খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক প্রতিযোগী ও বিরোধীরা কি পরস্পরকে সন্দেহ করে, রাজনৈতিক আলোচনা ও আদানপ্রদান কি তুলনামূলকভাবে স্বাধীন ও সহজভাবে ঘটে, রাজনৈতিক বিষয়ে যোগাযোগের মাধ্যমে কি সীমাবদ্ধ এই প্রশ্নগুলি কোনও দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে অনুধাবনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। জার্মানী ও ইতালীতে গত ৫০ বছরের দুঃখজনক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার জন্য রাজনীতিকে ব্যক্তিগত আদানপ্রদানের বিষয় হিসাবে পরিত্যাজ্য মনে করা হয়। এর ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সংযোগ বিঘ্নিত হয়। অন্যদিকে ব্রিটেনে অভিজাত রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতি জনগণের বিশ্বাস দেখা যায়। রাজতন্ত্র ও লর্ডসভা ব্রিটেনে এখনও বর্তমান। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে ব্যাপক গণতন্ত্রীকরণ ঘটেছে। জনসাধারণের জন্য দলব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণে কিছু শ্রমিকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। ভোটের উচ্চ সংখ্যা ও দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন থেকে বোঝা যায় যে জনগণ বর্তমান রাজনৈতিক কাঠামো থেকে নিজেদের আলাদা মনে করে না, যদিও সামান্য কিছু লোকই সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকে; ফলে এখানে সাম্যমূলক গণতান্ত্রিক সমাজের ধারণার সঙ্গে শ্রদ্ধামূলক অভিজাততান্ত্রিক সমাজের সংমিশ্রণ ঘটেছে এবং একটি স্তরবিন্যস্ত অথচ ঐক্যবদ্ধ, সাবেকী অথচ আধুনিক রক্ষণশীল অথচ উদারনৈতিক সমাজ সৃষ্টি হয়েছে ।

রাজনীতি কি সামঞ্জস্য বিধানকারী নাকি বিরোধ ও বিভেদসূচক প্রক্রিয়া—এই প্রশ্নটিও রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রশ্নের সঙ্গে সংযুক্ত। ব্রিটেনের সাধারণ ধারণা এই যে যারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তারা স্বার্থের বৈধ প্রতিনিধিত্ব করে। আইনপ্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সমস্ত স্বার্থযুক্ত লোকেদের পরামর্শ ও কথাবার্তার ঐতিহ্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যে বৈধতা প্রয়োজন ও চাহিদা পূর্ণ করে তার প্রতিফলন। এরই উল্টো ধারণা হল এই যে রাজনীতির প্রাধান্য বিস্তারের জন্য অবিরাম সংগ্রাম প্রয়োজন। মার্ক্সীয় মত এই পরিপ্রেক্ষিত পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে। এখানে সমস্ত রাজনৈতিক ক্রিয়াকেই প্রাধান্যকারী শ্রেণীর অধস্তন শ্রেণীর উপর প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা কিংবা শোষিতদের শৃঙ্খলামোচনের চেষ্টা বলে মনে করা হয়।

রাজনৈতিক আদানপ্রদানে শিষ্টাচারের (Civility) স্তর এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ। সৌজন্য, রীতিসিদ্ধ পদ্ধতি ও আদর্শ রাজনৈতিক ভিন্নমতের কঠোরতাকে কিছুটা হ্রাস করে। ব্রিটেন ও আমেরিকার আইনসভার রীতিসিদ্ধ ও রীতিবহির্ভূত প্রয়াসগুলি এই ধরনের প্রবণতার প্রতিফলন। এ জাতীয় পরিমিত আদর্শের (Moderating Norms) অভাবে আফ্রিকা ও এশিয়ার স্বাধীন দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক রাজনীতি কার্যকরী করতে অসুবিধা হয়।

সংবেদশীল (Responsive) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি চরম পরীক্ষা হল সরকারি ক্ষমতা এক ধরনের নেতৃত্ব থেকে অন্য ধরনের নেতৃত্বের হাতে বদল করার ক্ষমতা। যদি ব্যক্তিগত আস্থার স্তর খুবই নিম্নমানের হয়, যদি রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে জীবনমৃত্যু সংগ্রাম মনে করা হয় এবং রাজনৈতিক সৌজন্য উগ্র সংগ্রামকে প্রশমিত না করে তাহলে পদাধিকারী অভিজাত গোষ্ঠীর পক্ষে তাদের ভূমিকা পরিত্যাগ করা এবং নতুন সরকারের জন্য পথ ছেড়ে দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজে রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃত ভূমিকা জানা প্রয়োজন। রাজনৈতিক ব্যবস্থা কি প্রচলিত অর্থনৈতিক ধারার ও সামাজিক আচরণের সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে নাকি সমাজ পরিবর্তনের উপায় হিসাবে পরিগণিত হয়; রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামর্থ্য কি বাড়ানো উচিত, নাকি তাকে সন্দেহের চোখে দেখা উচিত ও যতদূর

সম্ভব নিয়ন্ত্রিত রাখা উচিত, রাষ্ট্র কি বিস্তৃত জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে নাকি অনিয়ন্ত্রিত বাজার-অর্থনীতি সমর্থন করে—এই প্রশ্নগুলি সবসময় গণনীতি সংক্রান্ত বিতর্কে ওঠে না? প্রায়শ রাজনৈতিক সংস্কৃতি কিছু সীমা নির্ধারণ করে দেয় এবং বিতর্ক চলে সেই সীমাসংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি কোনও বিশেষ নীতি মানছে কিনা তার ভিত্তিতে। কিন্তু পূর্ববর্তী প্রশ্নগুলি রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতি অনুধাবনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি মূল্যবান ধারণামূলক যন্ত্র (Tool), যার সাহায্যে আমরা রাজনৈতিক তত্ত্বের ব্যক্তি ও সমষ্টির গুরুত্ব (Micro-Macro Gap) সহজেই অতিক্রম করতে পারি। রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তির আলোচনা থেকে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার আলোচনায় পৌঁছানো যায়। ব্যক্তির ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, প্রতিক্রিয়া ও ব্যক্তিগত ঘটনার আলোচনা (Case Study) থেকে সমষ্টিগত পরিসংখ্যান ও গোষ্ঠী আচরণের ধারা জানা যায়। এই ধারা রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক আচরণ প্রতিফলিত করে। রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ স¥¤ন্ধে দৃষ্টিভঙ্গীর বণ্টন ব্যবস্থাকে প্রকাশ করে এবং ব্যক্তিগত প্রবণতার সঙ্গে রাজনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যকে যুক্ত করে।

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্বের দু'টি দিক আলোচনা করুন?
(১০ পঙ্ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)
২। এশিয়া ও আফ্রিকার রাজনৈতিক সংস্কৃতির যে কোনও একটি দিকের গুরুত্ব আলোচনা করুন।
(৫ পঙ্ক্তির মধ্যে আপনার উত্তর সীমাবদ্ধ হবে)

## সারাংশ

রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত আধুনিক আলোচনার শুরু বিংশ শতকে অ্যালমন্ড ও ভার্বার হাতে। লুসিয়ান পাই, পাওয়েল, অ্যালান বল, বুবলাটস্কি ইত্যাদি লেখকও রাজনৈতিক সংস্কৃতির আলোচনা করেছেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সদস্যদের রাজনীতির প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব তাকেই রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলা হয়। এটি একটি মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। রাজনৈতিক সংস্কৃতি রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বদলে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ স¥¤ন্ধে জনগণের মনোভাবকে বোঝায়। এই মনোভাব রাজনৈতিক ব্যবস্থা ও ক্রিয়াকলাপকে সমর্থন করতে পারে, বিরোধিতাও করতে পারে। তাই জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা স¥¤ন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী সমজাতীয় হয় না, বিভিন্ন ধরনের হয়। কোথাও এই দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য বেশি হলে সেখানে রাজনৈতিক উপসংস্কৃতির অবস্থান থাকে। ভাষা, অঞ্চল, ধর্ম, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদির ভিত্তিতে ভারতে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

রাজনৈতিক সংস্কৃতির তিনটি দিক আছে—রাজনৈতিক সংস্কৃতি সংক্রান্ত জ্ঞান বা ধারণা, রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম বা বিরোধী অনুভূতি এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল্যমান বিচার। তিনটি দিকের উপর ভিত্তি করে রাজনৈতিক সংস্কৃতিকে তিনভাবে ভাগ করা যায়—অংশগ্রহণকারী অধীনস্থ এবং সংকীর্ণ রাজনৈতিক সংস্কৃতি। তিনটি ধরনের কোনোটিই একক ও অবিকৃতভাবে কোথাও দেখা যায় না, মিশ্রিত থাকে। মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতির আবার চারটি প্রকারভেদ হল—সংকীর্ণ-অধীনস্থ, অধীনস্থ-অংশগ্রহণকারী, সংকীর্ণ-অংশগ্রহণকারী এবং পৌর সংস্কৃতি।

ঐতিহাসিক বিকাশ, ঔপনিবেশিক শাসন, ভৌগোলিক অবস্থান, জাতিগত বিভিন্নতা, ধর্ম, আর্থসামাজিক কাঠামো, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও শ্রেণী কাঠামো হ'ল রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিভিন্ন নির্ধারক। বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের প্রতীকের মাধ্যমে রাজনৈতিক সংস্কৃতি স¥¤ন্ধে জনগণের আবেগ, অনুভূতি ও উত্তেজনা জাগরণ দ্বারা একদিকে জাতীয় ঐক্য রক্ষার প্রচেষ্টা চলে এবং অন্যদিকে সরকার তার বৈধতা প্রতিষ্ঠা চালায়।

যে কোনও দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার রাজনৈতিক সংস্কৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রকৃতির ওপরই রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি চির পরিবর্তনশীল। নতুন ধারণা, শিল্পায়ন, নতুন নেতৃত্ব, যুদ্ধ, বিপ্লব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংস্কৃতিতেও পরিবর্তন ঘটে।

## অনুশীলনী

১। রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়? রাজনৈতিক সংস্কৃতির তিনটি দিক কী কী? এই দিকগুলি কোন্ কোন্ রাজনৈতিক বিষয়সংক্রান্ত হতে পারে?

২। রাজনৈতিক উপসংস্কৃতি কাকে বলে?

৩। রাজনৈতিক সংস্কৃতির শ্রেণীবিভাগ কীভাবে করা হয়? মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতি কী? মিশ্র রাজনৈতিক সংস্কৃতির ধরনগুলি কী কী?

৪। রাজনৈতিক সংস্কৃতির নির্ধারকগুলি কী কী?

৫। রাজনৈতিক সংস্কৃতির গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করুন।


১। Gabrial A. Almond and Sidney Verva : The Civic Culture, Sage Publication, Newbury Park, London, New Delhi. 1989, pp. 1-44.

২। Lucian Pye & Sidney Verva (ed) : Political Culture and Political Development, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1965, pp. 1-24.

৩। Allan R. Ball : Modern Politics and Government, English Language Book Society & Macmillan, London, ELBS ed 1982, pp. 52-63.

৪। Amal Kumar Mukhopadhyay : Political Sociology, K.P. Bagchi, Calcutta—1994, pp. 86-102.

৫। অনাদি কুমার মহাপাত্র : রাজনীতিক সমাজতত্ত্ব, সুহৃদ পাবলিকেশন, কলেজ স্কোয়ার (পশ্চিম), কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৩৭৮-৩৯৯।

৬। প্রাণগোবিন্দ দাশ : আধুনিক রাষ্ট্রতত্ত্ব, নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯০, পৃষ্ঠা ৬৮২-৫৯৮।